দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 JUL 1987 ... ...
পৃষ্ঠা... .. 5, 3 ... ...

005

[illegible]

বাংলাদেশের প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে নদিয়ায় হয়েছিল এবং সেখানে হিন্দুগণই যে মুসলমানদের উপরে হামলা করেছিল গত সপ্তাহে এই কলামে আমি তা বর্ণনা করেছি। আজ বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার সূচনা যে ঠিক কখন এবং কোন্ রচনা দিয়ে শুরু হয়েছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে বহুভাষাবিদ বুজর্গ ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, তা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন— "দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য যে, বাংলার হিন্দু লেখকেরা সাম্প্রদায়িক সাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেন। তারপর মুসলমান লেখকেরা গালির বদলে গালি শুরু করেন।" (আমাদের সমস্যা— ভাষা সাহিত্য, রেনেসাঁ পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৪৯)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ময়দানের সাম্প্রদায়িকতার মত সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার সূচনা করার সকল কৃতিত্বও হিন্দুদেরই পাওনা হয়ে যাচ্ছে। "আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারতাম বঙ্গদেশের বাঙ্গালী হিন্দুগণ নিজেদের ভারতের শ্রেষ্ঠ বাশিন্দা হিসেবে জ্ঞান করে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই ছাতুখোর আর মুসলমানেরা সকলেই তাদের কাছে বহিরাগত ও যবন। মুসলমানদের মধ্যে প্রতিভাশালী কেউ থাকতে পারে তা তারা একবাক্যেই যেন অস্বীকার করত।" (যে কালটা পার হয়ে এলাম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, দৈনিক সংগ্রাম, ১২ই জুন, ১৯৮৭)। এই মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের নেতৃত্ব। "পাকিস্তান সৃষ্টির আগের একশ' বছরের মুদ্দতে বাংলা সাহিত্যের নেতৃত্ব ছিল হিন্দুদের হাতে। শুধু ফর্ম ও কনটেন্টেই নয়, প্রাণ, রূপ ও আংগিকেও। সব ব্যাপারেই বাংলা সাহিত্য ছিল হিন্দু কৃষ্টির বাহন, অতএব হিন্দু-সাহিত্য। এটা অবশ্য স্থূল ও সুপারফিশিয়াল দৃষ্টি। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টি।" (আত্মকথা, আবুল মনসুর আহমদ, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৭৮)। এই মনোভাব এবং এই নেতৃত্বের কারণে হিন্দু লেখকগণ অবাধে প্রাণ ভরে কলম খুলে মুসলমানদের গালি দিয়েছেন। গল্পে-উপন্যাসে, কাব্যে-নাটকে তাদের কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। মানব চরিত্রের এমন কোনও কলংক নেই যা তারা মুসলমানদের উপরে আরোপ করেননি। হেম চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, নবীন চন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রমুখ সকলেই একই পথের পথিক হয়েছেন। তাঁদের বিষয়বস্তু হয়ত পৃথক হয়েছে প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন হয়েছে কিন্তু মুসলমানকে হেয় প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে ঘায়েল করার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। তাঁদের এই মুসলিম বিদ্বেষ এত তীব্র, তীক্ষ্ণ ও প্রবল ছিল যে মুসলমান মাত্রই তাঁদের প্রবল ঘৃণার পাত্র হওয়া সত্ত্বেও কোনও মুসলমান যদি কখনও তাঁদের এই সাম্প্রদায়িক ভূমিকার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন অমনি তাঁরা পরম সমাদরে তাকে বুকে তুলে নিয়েছেন। আবার কোনও হিন্দু যদি কখনও মুসলমানের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন অমনি তাঁরা তাকে যবন সমতুল্য জ্ঞান করেছেন।

বঙ্কিম-সাহিত্যের বিষাক্ত মুসলিম বিদ্বেষে মুসলিম সমাজ যখন জর্জরিত সেই সময় ১৯৩৮ সালে রেজাউল করিম নামক এক ব্যক্তি "বঙ্কিম চন্দ্রের নিকট মুসলমানের ধর্ম" নামের একখানি বই লিখে রাতারাতি জাতে উঠে "ভদ্র লোক" হয়ে যান। সেই তিনিই হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সম্প্রতি "সংস্কৃতি-সমন্বয় কিছু ভাবনা" নামক আর একখানি বই রচনা করায় কলাকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি-লিট খেতাব দিয়েছেন। (মাসিক চতুরঙ্গ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪)। পক্ষান্তরে শৈলবালা ঘোষ জায়ার নসিবে জুটেছে বিদ্রুপ ও লাঞ্ছনা। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ উল্লেখিত স্মৃতিকথায় বলেছেন— "সে যুগের যে পুস্তক পাঠে সবচেয়ে বেশি অভিভূত হয়েছিলাম তা শৈলবালা ঘোষ জায়া প্রণীত 'শেখ আন্দু'। একখানা উপন্যাস। সে উপন্যাসে শৈলবালা মুসলিম মোটর গাড়ি চালক শেখ আনোয়ার উদ্দিনকে এক মহৎ চরিত্র হিসেবে সৃষ্টি করে হিন্দু সমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয় হয়েছিলেন। আমরা শুনতে পেতাম তখন না-কি হিন্দু সমাজের লোকেরা তাঁর নাম দিয়েছিল শৈলবালা শেখ জায়া। শৈলবালা ছিলেন রাজশাহীর মেয়ে। দেশ বিভাগের পরে কলকাতায় চলে যাওয়ার পূর্বে তিনি তার পুস্তকের কপিরাইট ইকবাল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা মুজিবুর রহমানকে দিয়ে গিয়েছিলেন।" কারণ স্পষ্টতই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কলকাতার সমাজে ওসব যবন-ম্লেচ্ছের কাহিনী চলবে না।

এমনকি পাঠপুস্তকও, যা মুসলমান ছাত্রদেরও বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হত, এই উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে রেহাই পায়নি। ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের ত্রয়োদশ অধিবেশনে সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী এই উন্মত্ত মুসলিম বিদ্বেষের কিছু নমুনা তুলে ধরেন। পরে তিনি তাঁর ঐ বক্তৃতা কাপালিটোলা লেন কলকাতা থেকে চটি-বই আকারে প্রকাশ করেন (৫ই মার্চ, ১৯০০)। সেখান থেকে আমি কয়েকটি নমুনা উধৃত করছি—

১। ১৮৯৪ সালের মধ্য বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্ন— "কেন বিষ্ণুপ্রিয়া রমা সাগরতলে গিয়া বাস করিয়াছিলেন?

২। কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস— মুসলমান ধর্ম পুস্তক কোরানের মতে ধর্ম প্রচারার্থে বল প্রয়োগ করায় পাপ নাই বরং পুণ্য আছে। (১৭ পৃষ্ঠা)।

৩। হারান চন্দ্র রক্ষিত প্রণীত মন্ত্রের সাধন— কামোম্‌তত্ত আকবর কম্পিত চরণে টলিতে টলিতে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া কহিল— সুন্দরি! যতই বল না কেন, দিল্লীশ্বরের আশা পূর্ণ না করিয়া আজ তুমি যাইতে পারিতেছ না। কিরণ ক্রোধপ্রদীপ্ত সিংহিনীবৎ গর্জিয়া উঠিল— মূঢ়ঝ, যবন! যদি আর একপদ অগ্রসর হইবি ত প্রাণ হারাইবি। ওহো! এই কি দিল্লীশ্বরে বা জগদীশ্বরে বা? রাম! রাম! (১৬৮ পৃষ্ঠা)।

৪। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতা সংগ্রহ— কেবলই মরজী তেড়া, কাজে ভেড়া, নেড়ে মাথা, যত; নরাধম নীচ নাই নেড়েদের মত।

পরবর্তীকালে সাহিত্য ক্ষেত্রে পদার্পণ করে মুসলমানগণ এই অনাচারের প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনও গালি দেননি। শালীনতার সীমা লংঘন করেননি। তাঁরা অসত্যের মুকাবিলায় সত্য তুলে ধরেছেন মাত্র। এই প্রতিবাদী মুসলিম লেখকগণ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর রচনাতেই সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে। "রায়-নন্দিনী" উপন্যাসের উপক্রমনিকায় তিনি বলেছেন, (বাণীকুঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ২০শে ফাল্গুণ, ১৩২২)— "উপন্যাস এবং নাটক-নভেলে বাংলা ভাষা আজ ভারাক্রান্ত। আর সেই সমস্ত গ্রন্থের পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে মুসলমানের অলীক কলংক, কুৎসা এবং বিজাতীয় বিদ্বেষ এবং ঘৃণা পরিপূর্ণ। উপন্যাসগুলি মোসলেম বিদ্বেষের অনলকুণ্ড। সে অনলকুণ্ডে বিরাট-কীর্তি, বিপুল-যশা, সিংহতেজা মুসলমান জাতির গোলাম হইতে সম্রাট নবাব এবং বেগম ও শাহজাদীগণ পর্যন্ত নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে! বাঙ্গালীদিগের পূর্বপুরুষগণ অবলুণ্ঠিত মস্তকে যাঁহাদের পদধূলি শিরে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল, নিখিল জগৎ যে মুসলমানের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়াছিল, যাঁহাদের চরিত্র-প্রভায়, জ্ঞান-গরিমায় এবং বীর্য-মহিমায় সমস্ত জগত মুগ্ধ হইয়াছিল— হায়! আজ সেই বিশ্বপূজ্য মুসলমান, বাঙ্গালী লেখকদিগের অপার কৃপায় অতি ঘৃণিত পিশাচ এবং অস্পৃশ্য কাম-কুক্কুটরূপে চিত্রিত এবং বর্ণিত! হায়! যে নূরজাহান, রেজিয়া সোলতানা, জেবুন্নেছা, জাহানারা, মমতাজ মহল, দৌলতুন্নেছা প্রভৃতি বেগম ও শাহজাদীগণের পুণ্যপ্রতিভায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোকিত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহাদের নামকরণেও পুণ্যসঞ্চার হয়, হায়! সেই সব বিদূষী পূতচরিত্রা সম্মানিতা মহিলাদিগকেও যারপরনাই হীনচরিত্রা এবং হিন্দু-প্রেমোন্মাদিনী রূপে অংকিত করা হইয়াছে! এ অত্যাচার, এ অবিচার একেবারেই অসহ্য! এ যন্ত্রণা একেবারেই মর্মন্তুদ!.... একই দেশের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব থাকা সর্বদা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী ভ্রাতারা কাল্পনিক আর্যামীর গৌরবগানে বিভোর হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন অবস্থায় লেখনী পরিচালনায় দারুণ অসদ্ভাবের বীজ রোপণ করিতেছেন। দেশমাতৃকার কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাদের সাবধানতার জন্য এবং মুসলমানদের আত্মবোধ জন্মাইবার জন্যই, উপন্যাসের ঘোর বিরোধী আমি, কর্তব্যের নিদারুণ তাড়নায় "রায়-নন্দিনী" রচনা করিয়াছি। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমানের যে চিত্র অংকিত করিয়াছি, তাহাই অতীতের স্বাভাবিক চিত্র। মুসলমানের চরিত্রবল, মহত্ত্ব এবং স্বজাতি প্রেমের উন্মাদনা সকল জাতি অপেক্ষা বেশী ছিল, ইহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। নতুবা সহস্র বৎসর পর্যন্ত মুসলমান কখনও নিখিল ধরণীর একচ্ছত্র অধিপতি, ধর্মগুরু ও সভ্যতার শিক্ষক রূপে বিরাজ করিতে পারিতেন না। আজও বিশ্ববক্ষ হইতে তাঁহার প্রতাপ ও প্রভাবের জ্যোতিঃ নিভিয়া যায় নাই।"

অথচ এখনও এই মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে পৌরহিত্য, উপাচার্য, স্নাতক প্রভৃতি হিন্দু শব্দ কবুল না করায় এবং খোশ আমদেদ, মুবারকবাদ, মারহাবা প্রভৃতি মুসলিম শব্দ ব্যবহার করায় একটি মহল গলা ফাটিয়ে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিচ্ছে। কিমাশ্চর্য অতঃপরম!